**সচিব-সভা**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা, সোমবার, ০২ সেপ্টেম্বর ২০১৩

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

প্রিয় সচিববৃন্দ,

বর্তমান সরকার দায়িত্বভার গ্রহণের পর আজ ষষ্ঠবারের মত আমি সচিব সভায় উপস্থিত হয়ে আপনাদের সঙ্গে মতবিনিময় করছি। গত বছরের ১৯শে সেপ্টেম্বর সচিবদের সঙ্গে অনুষ্ঠিত আমার সর্বশেষ সভার পর ১৭ জন কর্মকর্তা সচিব পদে পদোন্নতি লাভ করেছেন এবং ৬ জন কর্মকর্তা ভারপ্রাপ্ত সচিব হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন।

ইতোমধ্যে অনেকে নতুন মন্ত্রণালয় বা বিভাগের কার্যভার গ্রহণ করেছেন। আমি আপনাদের সকলকে অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং নিজ নিজ ক্ষেত্রে আপনাদের সাফল্য কামনা করছি।

আমাদের সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট বিভিন্ন প্রতিকূলতা দক্ষতার সঙ্গে মোকাবিলা করে দেশকে একটি স্থিতিশীল অবস্থানে নিয়ে এসেছে। আমাদের সহযাত্রী হওয়ায় আপনাদের আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

২০০৯ সালের ৬ জানুয়ারি দায়িত্ব গ্রহণের পর আমরা আমাদের মেয়াদের প্রায় শেষপ্রান্তে এসেছি। আমাদের অর্জনগুলো আমি আপনাদের সামনে সংক্ষেপে তুলে ধরতে চাই।

অর্থনৈতিক অবস্থা,

রূপকল্প ২০২১-কে সামনে রেখে আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম-আয়ের দেশে পরিণত করা। বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা সত্ত্বেও বাংলাদেশ গড়ে ছয় শতাংশের ওপর বার্ষিক প্রবৃদ্ধি বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। মূল্যস্ফীতি সহনীয় পর্যায়ে রয়েছে। গত বছর এপ্রিল মাসে মূল্যস্ফীতির হার ছিল ৯.৯৩ শতাংশ। বর্তমানে তা ৭ শতাংশে হ্রাস পেয়েছে।

গত চার বছরে রেমিট্যান্স প্রবাহের গড় প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১২.৮ শতাংশ। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ১৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি সামাজিক খাতেও বাংলাদেশ লক্ষণীয় সাফল্য অর্জন করেছে। সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষমাত্রার প্রায় সবগুলো লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশ সুদৃঢ় অবস্থানে রয়েছে।

চলতি অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ ধরা হয়েছে ৬৫ হাজার ৮৭০ কোটি টাকা। জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য বর্তমান সরকার ২০১০-২১ মেয়াদি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা এবং ২০১০-১৫ মেয়াদি ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। এডিপি বাস্তবায়নের হার এবং ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে।

তবে, ভবিষ্যতে বার্ষিক উন্নযন কর্মসূচি বাস্তবায়নের হার আরও বৃদ্ধির সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। অর্থবছরের শুরুতেই উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবভিত্তিক ও সময়বদ্ধ কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করে সেগুলো বাস্তবায়ন করতে হবে।

কৃষি ও প্রাণিসম্পদ,

২০১৩ মধ্যে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের পাশাপাশি খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ছিল সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। এজন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। সারাদেশে কৃষকদের মধ্যে উপকরণ সহায়তা কার্ড প্রদান করা হয়েছে। সারের মূল্য কৃষকের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখার জন্য তিন দফায় নন-ইউরিয়া সারের মূল্য হ্রাস করা হয়। গত ৪ বছরে ধানের উৎপাদন বেড়েছে প্রায় ৫০ লাখ মেট্রিক টন।

কৃষিখাতের সার্বিক উন্নয়নে গত চার অর্থবছরে কৃষি ভর্তুকি বাবদ প্রায় ২৩ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরে কৃষি ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ১৪ হাজার ৫৯৫ কোটি টাকা। ফেব্রুয়ারি ২০১৩ পর্যন্ত সরকারি খাদ্য গুদামের ধারণ ক্ষমতা বেড়ে ১৮.৫০ লাখ মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে তা প্রায় ২০ লাখ মেট্রিক টনে উন্নীত হবে।

গত চার বছরে মৎস্যখাতে গড় প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৫.০৮ শতাংশ এবং প্রাণিসম্পদ খাতে ৩.৪৪ শতাংশ।

খাদ্য নিরাপত্তা, সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন,

সকলের জন্য খাদ্য নিশ্চিত করার উদ্দেশে পিওর ফুড অর্ডিন্যান্স, ১৯৫৯ যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে মন্ত্রিসভা ইতোমধ্যে নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর খসড়ার নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে।

২০১৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশের মোট ১০ লাখ অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য হ্রাস করার জন্য সরকার সমবায় আন্দোলনকে কাজে লাগাতে চায়। সমবায় আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য জাতীয় সমবায় নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

সরকার দেশের ৬৪টি জেলায় ৪ হাজার গ্রামের সকল শ্রেণি ও পেশার নারী-পুরুষকে সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি'র আওতায় আনার লক্ষ্যে কাজ করছে। প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি। দেশের অতি দারিদ্র্যপীড়িত অঞ্চল এবং পার্বত্য এলাকার দরিদ্র জনগণের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

বিদ্যুৎ,

দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা মেটাতে আমাদের সরকার বিদ্যুৎ খাতকে জরুরি খাত হিসেবে ঘোষণা করেছে। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধিকেও এই সরকার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করেছে।

রূপকল্প-২০২১ অনুযায়ী সরকার বিদ্যুৎ, তেল, গ্যাস ও অন্যান্য জ্বালানিসম্পদ খাতে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে ৫৫টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মিত হয়েছে।

আমরা দায়িত্ব গ্রহণের সময় বিদ্যুতের উৎপাদন ছিল ৩ হাজার ২০০ মেগাওয়াট। বর্তমানে সর্বোচ্চ ৬৬৭৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৯০০০ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে।

ইতোমধ্যে সরকার ২০ লাখ সোলার হোম সিস্টেম চালু করেছে। প্রায় ৩৪ লাখ গ্রাহককে নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। বিদ্যুতের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কয়লাভিত্তিক ১ হাজার ৩২০ মেগাওয়াট ক্ষমতার বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

পাবনার রূপপুরে ১ হাজার মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ২টি পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে রাশিয়ার সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ভারত থেকে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ এ বছরই আসবে। আশা করা যায়, আগামী ২০১৫ সাল নাগাদ মোট উৎপাদন ক্ষমতা ১৪ হাজার ৫০০ মেগাওয়াটে উন্নীত হবে।

জ্বালানি,

সরকার গ্যাস উন্নয়ন তহবিল গঠন এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালা ও গ্যাস উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়ন করেছে।

বঙ্গোপসাগরে ২০০ নটিক্যাল মাইল নিবিড় অর্থনৈতিক এলাকা এবং এর পার্শ্ববর্তী মহিসোপান এলাকায় নিরঙ্কুশ আইনগত স্বীকৃতি লাভের ফলে তেল ও গ্যাস অনুসন্ধানে এক বিপুল সম্ভাবনার দ্বার উম্মোচিত হয়েছে।

এ সম্ভাবনা কাজে লাগিয়ে গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে শিল্পায়ন ত্বরান্বিত করতে আমরা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নিয়েছি। বর্তমানে ১৯টি গ্যাসক্ষেত্র থেকে দৈনিক প্রায় ২ হাজার ২৬০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদিত হচ্ছে। আমাদের সরকারের ঐকান্তিক চেষ্টায় এ পর্যন্ত দৈনিক ৬৮০ মিলিয়ন ঘনফুট অতিরিক্ত গ্যাস জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হয়েছে।

আমরা বাপেক্সকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি জ্বালানি নিরাপত্তা বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ পেট্টোলিয়াম কর্পোরেশনের জ্বালানি মজুদ ক্ষমতা ৯ লাখ ৮৩ হাজার মেট্রিক টনে উন্নীত করেছি।

ডিজিটাল বাংলাদেশ,

তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলন এবং জ্ঞানভিত্তিক শিল্পে প্রতিভাবান তরুণদের ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং ই-গভর্ন্যান্স ও ই-কমার্স প্রবর্তনের মাধ্যমে আধুনিক ও উন্নত বাংলাদেশ গঠন সম্ভব।

২০১৪ সালের মধ্যে ই-গভর্ন্যান্স চালুর লক্ষ্যে দেশের ৪,৫৩০টি ইউনিয়নে ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। প্রতিটি জেলায় ই-সার্ভিস সেন্টার চালু করা হয়েছে। জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে মোট ২৪ হাজার ওয়েব পোর্টাল তৈরির কাজও প্রায় সমাপ্তির পথে। সেবা প্রদান প্রক্রিয়া সহজ ও স্বচ্ছ করতে ই-পেমেন্ট ও মোবাইল ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু হয়েছে।

ইলেকট্রনিক মানি অর্ডার, মোবাইল ক্যাশ কার্ড চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়া অনলাইনে সম্পাদন করার বিষয়টিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হচ্ছে। দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবলের সঙ্গে বাংলাদেশকে যুক্ত করার কাজ অনেকখানি এগিয়েছে। দেশের প্রায় সবক'টি উপজেলাকে ইন্টারনেট সংযোগের আওতায় আনা হয়েছে। ৩-জি প্রযুক্তির মোবাইল নেটওয়ার্ক এর বাণিজ্যিক কার্যক্রমও শুরু করেছে।

টেলিযোগযোগ ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের বিভিন্ন পদেক্ষেপের কারণে দেশে মোবাইল গ্রাহক সংখ্যা ৯ কোটি ৮৬ লাখ এবং ইন্টারনেট গ্রাহক সংখ্যা ৩ কোটি ৪০ লাখে উন্নীত হয়েছে।

মানবসম্পদ উন্নয়ন,

মানবসম্পদ উন্নয়নে বর্তমান সরকার বিভিন্ন প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছে। জাতিসংঘ ঘোষিত সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় মানবকল্যাণ এবং দারিদ্র্য বিমোচন বৈশ্বিক উন্নয়ন এজেন্ডার মূল কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে।

প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আমরা বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত ও দরিদ্র জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়নে মানবসম্পদ উন্নয়নের প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছি।

চলতি অর্থবছরের বাজেটে মানবসম্পদ খাতে মোট ৪৩ হাজার ৬১৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। ২০১৫ সালের মধ্যে সকলের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদান এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

দেশে বিদ্যমান ২৬ হাজার ১৯৩টি রেজিস্ট্রার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং এসকল বিদ্যালয়ে কর্মরত ১ লাখ ৪ হাজার শিক্ষকের চাকুরি সরকারিকরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। ইতোমধ্যে ২২ হাজার ৯৮৭টি রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করা হয়েছে।

অবশিষ্ট বিদ্যালয়সমূহকে জাতীয়করণ এবং জাতীয়করণকৃত বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকদের চাকুরি সরকারিকরণের কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে, যা আগামী জানুয়ারি ২০১৪-এর মধ্যে সম্পন্ন হবে।

সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার আলোকে সরকার স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতকে অগ্রাধিকার প্রদান করায় দেশের স্বাস্থ্যখাতেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। এ অর্জনের জন্য আমরা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছি।

গড় আয়ু বৃদ্ধি এবং প্রজনন হার, শিশুমৃত্যু ও মাতৃ-মৃত্যুর হার হ্রাসে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। নারীর রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ প্রণয়ন করা হয়েছে। পাশাপাশি শিশু স্বার্থ ও অধিকার রক্ষা এবং শিশু কল্যাণের লক্ষ্যে জাতীয় শিশু নীতিমালা ২০১১ প্রণয়ন করা হয়েছে।

দারিদ্র্য বিমোচন,

এদেশের দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য বর্তমান সরকারের নিরন্তর প্রচেষ্টার ফলে বাংলাদেশের দারিদ্র্যের মাত্রা উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে। ২০০৫ সালে চরম দারিদ্র্যের হার ছিল ৪০.৪ শতাংশ। বর্তমানে তা ২৬ শতাংশে হ্রাস পেয়েছে।

২০২১ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার ১৫ শতাংশে হ্রাস করার লক্ষ্য নিয়ে আমরা কাজ করছি। এজন্য অতিদরিদ্রদের জন্য টেকসই সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ে তোলা, অন্ততঃ ২০১৭ সালের মধ্যে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা সম্পূর্ণভাবে অর্জন এবং দীর্ঘমেয়াদি কৌশল হিসেবে বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ও ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা  বাস্তবায়নের বিষয়ে সরকারের জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী,

দারিদ্র্যের হার সহনীয় পর্যায়ে কমিয়ে আনতে আমাদের সরকার সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কার্যক্রম ও পরিধি উল্লেখযোগ্যভাবে সম্প্রসারণ করেছে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির উপকারভোগী সঠিক ও কার্যকরভাবে বাছাইয়ের লক্ষ্যে সরকার ন্যাশনাল পপুলেশন রেজিস্টারের সঙ্গে অতি দরিদ্রদের তালিকা তৈরির কাজ শুরু করেছে।

টেকসই দারিদ্র্য বিমোচনে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মৌলিক চাহিদায় প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণ এবং রূপকল্প ২০২১ ও ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আলোকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে নীতি ও কৌশল নির্ধারণপূর্বক একটি জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল প্রণয়নের কাজ চলছে।

শ্রম ও কর্মসংস্থান,

বৈদেশিক কর্মসংস্থান এবং প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ দেশে ক্রমবর্ধমান কর্মসৃজনের পাশাপাশি বেকারত্ব হ্রাস, দারিদ্র্য বিমোচন, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে ব্যাপক অবদান রেখেছে।

২০১১-১২ অর্থবছরে প্রায় ৬ লাখ ৯১ হাজার নাগরিক কাজের জন্য বিদেশ গমন করেছে। বর্তমানে প্রায় ৮৬ লাখের অধিক শ্রমিক ১৫৭টি দেশে কর্মরত রয়েছে।

আমাদের সরকার নতুন নতুন শ্রম বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে কুটনৈতিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছে এবং কয়েকটি দেশে বাংলাদেশ দূতাবাসে নতুন শ্রম উইং খোলা এবং বিদেশে চাহিদা রয়েছে এমন কাজের উপযোগী দক্ষ জনশক্তি তৈরির লক্ষ্যে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণের উদ্যোগ অব্যাহত রেখেছে।

জনশক্তি রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে মালয়েশিয়া সরকারের সঙ্গে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। এরফলে স্বল্প খরচে আগামী ৫ বছরে ৫ লক্ষাধিক শ্রমিক চাকুরি নিয়ে মালয়েশিয়া যেতে পারবে। শ্রমিক প্রেরণের জন্য হংকং ও জর্ডানের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। বর্তমান সরকারের অব্যাহত প্রয়াসে জানুয়ারি ২০০৯ থেকে মার্চ ২০১৩ পর্যন্ত ২১ লাখের অধিক বাংলাদেশি কর্মী কর্মসংস্থান নিয়ে বিদেশে গিয়েছেন।

স্বল্প সুদে অভিবাসন ঋণ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে প্রবাসীকল্যাণ ব্যাংক স্থাপন এবং ইতোমধ্যে ৭টি বিভাগীয় শহরে এ ব্যাংকের শাখা স্থাপন করা হয়েছে। এ ব্যাংক বিদেশগামী কর্মীকে অভিবাসন ঋণ প্রদান করে মধ্যপ্রাচ্যসহ মালয়েশিয়া সিঙ্গাপুর, ইতালি, মরিশাস, জর্ডান, দক্ষিণ কোরিয়া ও বাহরাইনে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে সহায়তা করেছে।

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের মাধ্যমে এপ্রিল ২০১৩ পর্যন্ত ১৪ কোটি ১৫ লাখ টাকা অভিবাসন ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

তৈরি পোশাকখাত,

বর্তমান সরকার শ্রমিকের স্বার্থ সংরক্ষণ ও তাঁদের জীবনমান উন্নয়নে বদ্ধপরিকর। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন ২০১৩ প্রণয়ন করেছে। এর আওতায় মৃত্যুজনিত ক্ষতিপুরণ, অপসারিত শ্রমিককে ক্ষতিপূরণ, ঝুঁকিপূর্ণ কাজে কিশোর ও প্রতিবন্ধী শ্রমিক নিয়োগ বন্ধ, শ্রমিকদের সার্বিক নিরাপত্তার স্বার্থে কর্মস্থলে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা স্থাপন ও শ্রমিকদের গ্রুপ বীমা প্রবর্তনসহ বিভিন্ন বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সম্প্রতি তাজরীন ফ্যাশন লিমিটেডে ভয়াবহ অগ্নিকান্ড এবং সাভারের রানা প্লাজায় ভবন ধ্বসের পর বিপন্ন শ্রমিকদের সহায়তা করতে সরকার সর্বশক্তি নিয়োগ করে। ভবিষ্যতে এ ধরণের দুর্ঘটনা এড়াতে ইতোমধ্যে তৈরি পোশাক কারাখানগুলোর কর্মপরিবেশ সুরক্ষা, দুর্ঘটনা প্রতিরোধ ও শ্রমিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা নিশ্চিত করতে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রিসভা কমিটি গঠন করা হয়েছে।

পাশাপাশি শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে আমাদের সরকার ন্যুনতম মজুরি ৩ হাজার টাকা ধার্য করে তৈরি পোশাকশিল্প সংশোধিত মজুরি কাঠামো ঘোষণা করে। এর ধারাবাহিকতায় এ মজুরি কাঠামো পুনরায় সংশোধনের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে আরেকটি ন্যুনতম মজুরি বোর্ড গঠন করা হয়েছে।

গার্মেন্টস সেক্টরের নিরাপত্তা ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রেখে উৎপাদন প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীর নেতৃত্বে ১৯ সদস্যের ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কোর কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ কমিটি গার্মেন্টস সেক্টরের শৃঙ্খলা রক্ষার পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার কাজে ভূমিকা পালন করবে।

এ সেক্টরকে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদানের জন্য সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর সভাপতিত্বে সংশ্লিষ্ট ১১টি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর সমন্বয়ে শিল্প বিষয়ক মন্ত্রিসভা কমিটি গঠন করা হয়েছে।

নারী ও শিশু অধিকার,

রাষ্ট্র ও সমাজের সকল ক্ষেত্রে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সকলপ্রকার বৈষম্য বিলোপ আমাদের সাংবিধানিক দায়িত্ব। নারীর ক্ষমাতায়ন, শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় তাঁদেরকে সম্পৃক্ত করার জন্য বর্তমান সরকার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

এ লক্ষ্যে ‘জাতীয় শিশু শ্রম নিরসন নীতি ২০১০', ‘পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন, ২০১০' ‘জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, ২০১১ এবং ‘জাতীয় শিশু নীতি, ২০১১' প্রণয়নসহ বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রসূতি ও নবজাতকের কল্যাণের কথা বিবেচনা করে আমরা মাতৃত্বকালীন ছুটি ৪ মাস থেকে ৬ মাসে উন্নীত করেছি। দুঃস্থ, এতিম, অসহায় পথশিশুদের নিরাপদ ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে ৬টি শিশু বিকাশ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

ড্রপ-ইন-সেন্টার, ইমারজেন্সি নাইট সেন্টার, শিশু-বান্ধব স্থান এবং উন্মুক্ত পরিবেশে বিদ্যালয়ের মাধ্যমে ডিসেম্বর ২০১২ পর্যন্ত ২০ হাজারের অধিক পথশিশুকে সামাজিক সুরক্ষা সেবা প্রদান করা হয়েছে।

অটিজম,

২০১০ সালে তৃতীয় বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস উদ্যাপনকালে সমাজকল্যাণ মান্ত্রণালয় ও জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে ঢাকার মিরপুরে ফাউন্ডেশনের নিজস্ব ক্যাম্পাসে অটিজম সেন্টার যাত্রা শুরু করে।

এ সেন্টার থেকে এ যাবত অটিজমের শিকার ৫০০ শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে বিনামূল্যে বিভিন্ন সেবা প্রদান করা হয়েছে। অটিজম রিসোর্স সেন্টারের ধারাবাহিকতায় জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন অঙ্গনে ২০১১ সালে একটি সম্পূর্ণ অবৈতনিক অটিস্টক বিদ্যালয় চালু করা হয়েছে। ৩০টি দরিদ্র পরিবারের ৩০ জন অটিস্টিক শিশুকে এ স্কুলের মাধ্যমে বিশেষ পদ্ধতিতে শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে।

এর পাশাপাশি অটিজম আক্রান্ত শিশুদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে আমরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘সেন্টার ফর নিউরো ডেভেলপমেন্ট এন্ড অটিজম ইন চিলড্রেন' প্রতিষ্ঠা করেছি।

ভূমি ব্যবস্থাপনা,

আবাসন, শিল্প ও বানিজ্যের কাজে ভূমি ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রতি বছর আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ প্রায় ০.৫ শতাংশ হারে হ্রাস পাচ্ছে। ভূমি অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ভূমির পরিকল্পিত ব্যবহারকে গুরুত্ব দিতে হবে।

ভূমির পরিকল্পিত ও সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করতে মোট ২১টি জেলার ১৫২টি উপজেলার ডিজিটাল ল্যান্ড জোনিং ম্যাপ সম্বলিত প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৪০টি জেলার ডিজিটাল ল্যান্ড জোনিং ম্যাপ তৈরির কাজ চলছে। 'কৃষি জমি সুরক্ষা ও ভূমি ব্যবহার আইন,২০১২' এর খসড়া প্রণীত হয়েছে।

শিক্ষা,

সরকার উচ্চ শিক্ষার সকলস্তরে ভর্তির সুযোগ সৃষ্টি ও শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে বদ্ধপরিকর। সৃজনশীল প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মৌলিক চিন্তার বিকাশকে উৎসাহিত করার কাজটি শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের আন্তরিক সহযোগিতায় সরকার সাফল্যের সঙ্গে পরিচালনা করছে।

আমরা ২০১৪ সালের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পাঠ্যক্রম যুগোপযোগীকরণ এবং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক বদলি নীতিমালা প্রণীত হয়েছে। নিরক্ষরতা দূরীকরণের লক্ষ্যে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। বর্তমানে প্রায় ৯৭ শতাংশ শিশু স্কুলে যাচ্ছে।

অন্যদিকে প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ার হার ৪৯.৩ শতাংশ থেকে কমে ২৯.৭ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। ইতোমধ্যে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে উৎপাদনমুখী, বিজ্ঞানসম্মত ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণয়ন ছাড়াও সরকার বেসরকারি শিক্ষা ব্যবস্থাকে মানসম্মত ও যুগোপযোগী করার জন্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০ প্রণয়ন করেছে।

বছরের প্রথম দিনেই মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত বিনামূল্যে বই বিতরণ নিশ্চিত করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের সহায়তা প্রদানের জন্য প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষাসহায়তা ট্রাস্ট ফান্ড আইন ২০১১ প্রণয়ন করা হয়েছে। শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধ করতে উপবৃত্তি প্রদান কর্মসূচি অব্যাহত রয়েছে। ভর্তির হার বৃদ্ধি এবং শিক্ষার্থীদের স্কুলে আসা উৎসাহিত করার লক্ষ্যে স্কুল ফিডিং কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

দেশের প্রতিটি মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষ চালু এবং বেশকিছু মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আইসিটি ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

শিল্পায়ন-রপ্তানি,

২০২১ সালের মধ্যে দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার অন্যতম পূর্বশর্ত হিসেবে জাতীয় আয়ে শিল্পখাতের অবদান ৩০ থেকে ৪০ ভাগে উন্নীত করা প্রয়োজন। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে শিল্পনীতি ২০১০ প্রণয়ন করা হয়।

গত অর্থবছরে রেকর্ড ২৭.০৩ বিলিয়ন ডলার রপ্তানি আয় হয়েছে। প্রবৃদ্ধির হার ১১ শতাংশ।

ইতোমধ্যে শিল্প আইন ২০১৩ প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। দ্রুত শিল্পায়ন এবং আমদানি-রপ্তানি প্রক্রিয়া সহজ করার উদ্দেশ্যে আমদানি-রপ্তানি নীতি যুগোপযোগীকরণ এবং জাতীয় শিল্পনীতি ২০১০ প্রণয়ন করা হয়েছে। পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশে জাতীয় পর্যটন নীতিমালা ২০১০ প্রণীত হয়েছে।

পরিবেশ ও উন্নয়ন,

ভৌগোলিক অবস্থান এবং আবহাওয়াগত কারণে বাংলাদেশ একটি দুর্যোগপ্রবণ জনপদ। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে দুর্যোগের এ ঝুঁকি বহুগুণ বেড়েছে। ১৯৯০ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগে মোট ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ২ হাজার ১৮৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

পরিবেশগত সমস্যাসমূহ মোকাবিলা করে দূষণমুক্ত পরিবেশ ও পরিবেশবান্ধব প্রতিবেশ গড়ে তুলতে বিভিন্ন নীতি এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

ইতোমধ্যে টেকসই পরিবেশ নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত জাতিসংঘ ঘোষিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা'র লক্ষ্য-৭ এর আওতায় নিরাপদ সুপেয় পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে।

সরকার জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতি মোকাবিলার লক্ষ্যে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত নীতি, কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। এ কৌশলপত্র বাস্তবায়নের জন্য নিজস্ব তহবিলে গঠন করা হয়েছে ‘জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড'। উন্নয়ন সহযোগী দেশসমূহের সহায়তায় ‘বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ রেজিলিয়েন্স ফান্ড' গঠন করা হয়েছে। এ ফান্ডে প্রাপ্ত সহায়তার অঙ্ক ১৮৯.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

সরকারের নেওয়া বিভিন্ন কার্যক্রমের ফলে বিগত কয়েক বছরের মধ্যে দেশে বৃক্ষ আচ্ছাদিত এলাকার পরিমাণ ৭-৮ শতাংশ থেকে বেড়ে ১৭.০৮ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

জীববৈচিত্র্য দেশের প্রতিবেশ ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় এক অমূল্য সম্পদ। আমরা দেশের মূল্যবান জীবসম্পদ সংরক্ষণে জাতীয় জৈব নিরাপত্তা কাঠামো প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছি।

উপকূল এবং জলাভূমির জীববৈচিত্র সংরক্ষণের লক্ষ্যে কক্সবাজার এলাকায় প্রায় ৬৫০ হেক্টর ম্যানগ্রোভ বন এবং হাকালুকি হাওর এলাকায় প্রায় ৮৬০ হেক্টর জলজ বন সংরক্ষণ করা হয়েছে। সেন্টমার্টিনস্ দ্বীপ ও টাংগুয়ার হাওরে চলছে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের কার্যক্রম।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে আনার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২ প্রণয়ন করা হয়েছে। ঘূণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০১১ জারি করা হয়েছে এবং জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০১০-২০১৫ অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ঘুর্ণিঝড় প্রস্ত্ততি কর্মসূচির আওতায় ৪৮ হাজার স্বেচ্ছাসেবক গড়ে তোলা হয়েছে। উপকুলীয় অঞ্চল নীতি, উপকূলীয় উন্নয়ন কৌশল ও অগ্রাধিকার ভিত্তিক বিনিয়োগ কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে।

উপকূলীয় এলাকায় জেগে উঠা চর অবৈধ দখলমুক্ত করে সেখানে ১১ হাজার ২৯৮ ভূমিহীন পরিবারকে প্রায় ১৬ হাজার একর জমি স্থায়ীভাবে বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে।

আগামী পাঁচ বছরে আরও ১৩ হাজার ৫৯০ একর জমি উদ্ধার করে সেখানে সাড়ে ৯ হাজার পরিবারকে পুনর্বাসন করার পরিকল্পনা রয়েছে। এরমধ্যে ২৭ হাজার একর এলাকায় ১৬ হাজার দরিদ্র পরিবারকে পুনর্বাসন করার উদ্যোগ নেওয়া হবে।

জনপ্রশাসন,

একুশ শতকের উপযোগী দক্ষ জনপ্রশাসন গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমাদের সরকার ব্যাপক সংস্কারমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। সরকারি কর্মকর্তাদের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বর্তমান বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন পদ্ধতির পরিবর্তে মুল্যায়নভিত্তিক ব্যবস্থা প্রচলনের কাজ চলছে।

জনপ্রশাসনে স্বচ্ছতা ও গতিশীলতা আনতে ই-গভর্ন্যান্স চালু করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে কিছু কিছু সরকারি অফিসে ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনার কাজ শুরু হয়েছে। সকল জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে চালু হয়েছে ই-সেবা কার্যক্রম। প্রশাসনিক সংস্কারের অংশ হিসেবে সরকারি কর্মচারি আইন প্রণয়ন, পদোন্নতি, পদায়ন ও বদলি নীতিমালা যুগোপযোগীকরণ মাঠ প্রশাসনের কাঠামো সংস্কার, মন্ত্রণালয়ের গুচ্ছায়ন, নতুন অডিট আইন প্রণয়ন ইত্যাদি বিষয়ে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য জাতীয় প্রশিক্ষণ নীতিমালার খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে। ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনার জন্য ডিজিটাল ফাইল ট্র্যাকিং সিস্টেমের কাজ চলমান রয়েছে। প্রশাসনকে গতিশীল ও যুগোপযোগী রাখতে সরকার ২০০৯ সাল থেকে ২০১২ সালের মধ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে ২ লাখ ৫২ হাজার পদ সৃজন করেছে।

বর্তমান সরকার সরকারি কর্মচারিদের অবসরের বয়সসীমা ৫৭ থেকে ৫৯ বছরে এবং মুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তা-কর্মচারিদের অবসরের বয়সসীমা ৫৯ থেকে ৬০ এ উন্নীত করেছে।

বর্তমান সরকারের আমলে প্রশাসনের বিভিন্নস্তরে (উপসচিব থেকে সচিব) মোট ২,৪৪৮ জন কর্মকর্তাকে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে।

কোন সরকারি কর্মচারি কর্তব্যরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে তাঁর পরিবারকে ৫ লাখ টাকা ও গুরুতর আহত হয়ে স্থায়ীভাবে অক্ষম হলে তাকে ২ লাখ টাকা অনুদান প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

সরকারি কর্মচারির দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য অনুদানের পরিমাণ ৫ হাজার টাকা হতে ২৫ হাজার টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। এছাড়া কর্মচারিগণের পোষ্যদের মৃত্যুর কারণে তার দাফন কিংবা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য ৫ হাজার টাকা করে অনুদান প্রদান করা হচ্ছে।

এছাড়া প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল হতে জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের জন্য বিশেষ অর্থ বরাদ্দ করা হয়। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ চাকুরিরত অবস্থায় অথবা অবসরের পর মৃত্যুবরণ করলে তাঁদের পরিবারকে মাসিক এক হাজার টাকা হারে সর্বোচ্চ ১৫ বছর অথবা কর্মকর্তা-কর্মচারির ৬৭ বছর বয়স, যা আগে আসে, সে ভিত্তিতে ভাতা প্রদান করা হয়।

মুক্তিযুদ্ধ,

বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীকে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ সম্মাননা বাংলাদেশ স্বাধীনতা সম্মাননা (মরণোত্তর) প্রদান করা হয়েছে।

ভারতের বর্তমান রাষ্ট্রপতি শ্রী প্রণব মুখার্জীসহ এযাবৎ ২১০ জন ব্যক্তি ও সংগঠনকে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা এবং মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মাননা পদক প্রদান করা হয়েছে। আমাদের সরকার মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে ১ লাখ ৫০ হাজার বীর মুক্তিযোদ্ধাকে সম্মানীভাতা এবং যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ পরিবারের সদস্যদের ভাতা ও রেশন প্রদানের কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

তদুপরি চলতি অর্থবছর থেকে খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের বর্ধিত হারে সম্মানীভাতা প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। সনদপ্রাপ্তি সাপেক্ষে অবশিষ্ট ৫০ হাজার মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের আত্ম-নির্ভরশীলতা অর্জনের লক্ষ্যে একটি ঘুর্ণায়মান তহবিলের আওতায় বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণসহ ঋণদান কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের কল্যাণ বিবেচনায় তাঁদের জন্য সরকারি সুবিধাদি বাড়ানো হয়েছে।

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা,

বর্তমান সরকারের আমলে ২০১১-১৬ সাল মেয়াদে প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে সরাসরি থোক বরাদ্দ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সারাদেশে ৪ হাজার ৫০৩টি ইউনিয়ন পরিষদে ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। উপজেলার জন্য আইন, বিধি ও নির্দেশিকা জারি করে এর কাজে গতিশীলতা বৃদ্ধি, জেলা পরিষদের প্রশাসক নিয়োগের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের পথ প্রশস্ত করা এবং সারাদেশে জন্মনিবন্ধন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে।

নির্বাচন,

বর্তমান সরকারের অধীনে সংসদীয় আসনে উপ-নির্বাচন এবং স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রায় ৬০০০ নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে এবং সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতার সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারি যে, আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনও সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচিত সরকারের অধীনে ও সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠিত হবে।

দুর্নীতি প্রতিরোধ,

দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে দুর্নীতি দমন কমিশন (সংশোধন) আইন ২০১১ জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করা হয়েছে।

বর্তমান সরকার দুর্নীতি দমন কমিশনকে স্বাধীন ও শক্তিশালী করতে তাদের চাহিদা মোতাবেক পর্যাপ্ত প্রশাসনিক, আর্থিক ও আইনি সহায়তা প্রদান করেছে। সর্বস্তরে শুদ্ধাচার ও সুনীতি প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম পরিবীক্ষণের জন্য ইতোমধ্যে জাতীয় শুদ্ধাচার উপদেষ্টা পরিষদ এবং এর নির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়েছে।

আশা করি সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টায় একটি দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গড়ে তুলতে আমরা সক্ষম হব। সুশাসন নিশ্চিত করার সুবিধার্থে বর্তমান সরকারের আমলে জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) আইন ২০১১ প্রণয়ন করা হয়েছে।

আইনের শাসন,

১৯৭১ সালে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধ ও যুদ্ধাপরাধের বিষয় ছিল বর্তমান সরকারের অন্যতম নির্বাচনী অঙ্গীকার। বর্তমান সরকার একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে সংঘটিত এ সকল অপরাধের জন্য অভিযুক্তদেরকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে। আন্তর্জাতিক আইন ও রীতিনীতির প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধাশীল থেকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল গঠন করে সরকার এ বিচার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

যুদ্ধাপরাধীদের রক্ষা করার জন্য একটি মহল ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে, তাঁদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দিয়ে এবং বিশৃঙ্খল ও নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করে দেশকে অস্থিতিশীল করতে চাচ্ছে।

এ পরিস্থিতিতে সরকার দেশপ্রেমিক ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী আপামর জনসাধারণকে সঙ্গে নিয়ে জামাত-শিবিরচক্র এবং তাদের দোসরদের যে কোন ষড়যন্ত্র ও নৈরাজ্য কঠোর হস্তে দমন এবং যে কোন মূল্যে জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধান করতে বদ্ধপরিকর।

সামাজিক অস্থিরতা মোকাবিলা,

সামাজিক অস্থিরতা সৃষ্টি এবং দেশের স্থিতিশীলতা বিনষ্ট করার অপচেষ্টা রোধ এবং সর্বত্র শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার লক্ষ্যে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, পেশাজীবী ও ব্যবসায়ী সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দকে নিয়ে গণসংযোগের মাধ্যমে জনমত সৃষ্টির নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

মহানগর, জেলা, উপজেলা, পৌরসভা ও ওয়ার্ড এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে সন্ত্রাস ও নাশকতা প্রতিরোধ কমিটি গঠনের মাধ্যমে এ উদ্যোগকে অধিকতর কার্যকর করা হয়েছে। জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসক এবং উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সভাপতিত্বে এ কমিটি গঠিত হয়েছে।

প্রিয় সচিববৃন্দ,

সম্প্রতি কিছু পত্রিকায় এ মর্মে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে যে, সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড জনপ্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তার কারণে স্থবির হয়ে পড়ছে। সরকারের ভাবমুর্তি ক্ষুণ্ণ করা এবং জনপ্রশাসনের মনোবল নষ্ট করার অসৎ উদ্দেশ্যে এ ধরণের অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। যা অনাকাঙ্ক্ষিত ও অনভিপ্রেত।

প্রকৃত অবস্থা হল, বর্তমান সরকারের সময়ে জনপ্রশাসনের গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করতে চাই যে, বতর্মান সরকারের মেয়াদে ২৬ আগস্ট ২০১৩ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত মোট ২১৬টি মন্ত্রিসভার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এতে গৃহীত ১,৪০৯টি সিদ্ধান্তের মধ্যে ১,৩০৮টি ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে। সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের হার ৯৩ শতাংশ।

এ ছাড়া বর্তমান সরকারের সময়ে মন্ত্রিসভা কর্তৃক চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত ২৩৪টি আইন ইতোমধ্যে জাতীয় সংসদে পাশ হয়েছে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নেও দক্ষতার স্বাক্ষর সুস্পষ্ট।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের উল্লেখযোগ্য অর্জন থাকা সত্ত্বেও যথাযথ প্রচারের অভাবে এবং স্বার্থান্বেষী মহলের অপপ্রচারের কারণে জনগণ প্রকৃত পরিস্থিতি জানতে পারছে না। এমতাবস্থায়, সরকারি কর্মকান্ডের যথাযথ প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ ব্যাপারে আপনাদেরও সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে।

সরকারের উন্নয়ন কর্মসূচিসমূহের বাস্তবায়ন যাতে কোনক্রমে বাধাগ্রস্ত না হয়, আপনারা সেদিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখবেন।

প্রিয় সচিববৃন্দ,

সংবিধান হচ্ছে রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত্তি। সংবিধান জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা ও জনগণের সামষ্টিক মূল্যবোধের প্রতিফলন। আমরা যে কোন মূল্যে সংবিধানের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব সংরক্ষণে বিশ্বাসী।

দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন আসন্ন। সংবিধানকে সমুন্নত রেখে সংবিধান-নির্ধারিত পন্থায়, নির্বাচনী আইন ও বিধি-বিধান অনুসরণে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

সরকারের কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে পরিচালিত হয়। আমি আশাবাদী, আপনারা যে চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমাদের সরকারের আদর্শ, নীতি ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে চলেছেন, নির্বাচনকালে সে চেতনা সমুন্নত রাখবেন।

 গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রতিনিধিত্বশীল সরকারের চিন্তা-চেতনার বাস্তব রূপায়ন ঘটে প্রজাতন্ত্রের কর্মবিভাগের মাধ্যমে। বর্তমান সরকারের মেয়াদ সমাপ্তির দিকে এগিয়ে চলছে। এ মেয়াদে আমাদের অর্জন অভূতপূর্ব, যার স্বাক্ষর বহন করছে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন কার্যক্রম এবং আর্থ-সামাজিক সূচকসমূহ।

অব্যাহত উন্নয়নের এই অভিযাত্রায় আপনারা আমাদের সাথী। আপনারাও আমাদের সাফল্যের অংশীদার। সে জন্য আপনাদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন। আমি আশা করব, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্য বাস্তবায়নে আপনারা আপনাদের মেধা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করবেন এবং কেবল সরকারি কর্মকর্তা নয়, দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে জনকল্যাণে আত্মনিয়োগ করার জন্য আপনাদের সহকর্মীদেরকেও উদ্বুদ্ধ করবেন, এ প্রত্যাশা রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।